একাদশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

মালদহের টাঙন নদীর অববাহিকার প্রাণচঞ্চল জনজীবনে পরোক্ষ ভাবে ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক প্রভাব সঞ্চরণশীল। এরই প্রেক্ষিতে অনেক সময় সচেতন বা অচেতন ভাবে রাজনৈতিক আবর্তে প্রবেশ করছেন অনেকেই। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গুপ্ত-পাল-সেন রাজত্বে যে-রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দীপনা দেখা গেছে, মুসলমান আমলে তা আরও পুষ্ট হয়েছে। এই উদ্দীপনা কখনও অস্থিরতা, কখনও সংশয় আবার কখনও অনুগ্রহের জন্ম দিয়েছে। ইংরেজ রাজত্বে দেশ জুড়ে যে-জাতীয়তাবাদের সঞ্চার হয়েছিল বরিন্দ এলাকাও তার বাইরে ছিল না। বরং এখানকার বীরদর্পী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে শুধু ইতিহাসেই নয়, মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে অবস্থান করছেন একঝাঁক ব্যক্তিত্ব। এঁদের মধ্যে জিতু হেমরম (রানিপুর), নরেশচন্দ্র সরকার (বুলবুলচণ্ডী), মহেন্দ্রনাথ দাস সরকার (আলাল), ভৈরব রায় (তিলাসন), রঘু দেশি (ভবানীকোঠা), রাধেশচন্দ্র শেঠ (পুরাতন মালদহ), হরিনন্দন ব্রহ্মচারী (হবিবপুর), প্রিয়নাথ ঘোষ (সিঙ্গাবাদ) প্রমুখ স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তবে ইতিহাস যা-ই বলুক, একুশ শতকে প্রবেশ করে এই এলাকার সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। তথাকথিত আধুনিকতার ঝাপটায় লোকায়ত সংস্কৃতি বাস্তবেই বিপন্ন। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা, শিক্ষা ও মননে এই রূপান্তরের প্রভাব স্পষ্ট।

স্থানীয় এলাকায় পর্যাপ্ত কাজের অভাবে ভিন রাজ্যের দাসত্বের শিকার এখানকার বহু মানুষ। মধ্যযুগীয় দাদনপ্রথার দাস হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সঙ্গী করে দালালদের পাতা ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা। হাজার হাজার মানুষ অস্থায়ী চুক্তির সাপেক্ষে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি এলাকায় কাজের জন্য পাড়ি দিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রেই হাড়-ভাঙা পরিশ্রম। চিকিৎসা ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা নেই। দালালেরা কোনও রকম করে এঁদের শ্রম শুষে নিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছেন। ফেরার সময় অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধি সঙ্গে নিয়ে আসছেন। কাজে গিয়ে কেউ কেউ মারাও যাচ্ছেন। কিন্তু এর কোনও সুরাহা নেই। জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পে বছরে ১০০ দিনের কাজ স্থানীয় ভাবে পাওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। তাই ভিন রাজ্যের কাজের উপর ভর করেই সংসার নির্বাহ করছেন বরিন্দের অজস্র পরিবার।

যদিও নিজেদের উদ্যোগে যাঁরা কাজে যাচ্ছেন তাঁরা বেশ স্বচ্ছন্দ আয় করছেন। অনেকেই অন্য রাজ্যের সংস্কৃতিকে মনে গেঁথে নিয়ে ফিরছেন। এতে কোনও কোনও পরিবারের চালচিত্র বদলে গেছে। সন্তানদের স্বেচ্ছায় স্কুলে পাঠাচ্ছেন অভিভাবকেরা। ডাইনি প্রথার মতো কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন ভিন রাজ্য থেকে ফিরে-আসা আদিবাসীরা। জানগুরু-জমানার অবসান ঘটাতে এখন আদিবাসী মহিলারাও সরব হয়েছেন। বরিন্দের সংস্কৃতিতে এটি ইতিবাচক সংযোজন।

টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ও সুলভ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাবে এইসব এলাকার যুবক-যুবতীদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটছে। প্রেমঘটিত বিয়ের সংখ্যা বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রেমের বদলে লাম্পট্য প্রাধান্য পাচ্ছে। গ্রামীণ মহিলাদের কেউ কেউ শাড়ির পরিবর্তে নাইটি, হাউস কোট প্রভৃতি পরিধানে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। পারিবারিক ও সামাজিক বাঁধনে শিথিলতা এসেছে। শহরের মতো গ্রামেও একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

পরিবর্তন এসেছে বাসগৃহেও। টালি-খোলার বদলে টিনের চালা বাড়ছে। বেশির ভাগ বাসগৃহ মাটির হলেও পাকা বাড়ি তৈরির প্রবণতা বেড়েছে। উন্নত গ্রামে চাকরিজীবীরা গৃহঋণ নিয়ে বাড়ি তৈরি করছেন। তবে গ্রামের নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের অনেক বাড়িতেই শৌচাগার নেই। স্বাস্থ্য-সচেতনতার অভাবে জীবাণুঘটিত রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামেও খাদ্যাভাসে পরিবর্তন এসেছে। অনেকেই ইদানিং রাতে ভাতের বদলে রুটি খাচ্ছেন। কম বয়সীদের মধ্যে পরটা, মোমো, চাউমিন, ম্যাগি প্রভৃতি খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। গ্রামীণ এলাকাতেও বিকোচ্ছে ঠাণ্ডা পানীয়। পিঠে-পুলির চল কমছে।

চাকরিজীবী হিন্দু ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে শহরমুখো হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। ফলে ঐতিহ্যবাহী হিন্দু জনপদের সংখ্যা কমছে। কিন্তু

মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামগুলি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের গ্রামীণ অনুরাগের ফলে এমনটা ঘটছে। যে-কোনও সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তি গ্রামে থাকলে ক্রমশ তা বর্ধিষ্ণু হয়। কিন্তু এখানকার বেশির ভাগ গ্রামেই এর উলটোটা ঘটছে।

কৃষিতেও আমূল পরিবর্তন এসেছে। কাঠের লাঙলের বদলে মোটরচালিত ট্রাক্টরের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। অনেক এক-ফসলিতে জমিতে ধান চাষের পর গম ও সবজি চাষ হচ্ছে। উন্নত প্রথায় চাষ-আবাদ করে বরিন্দের অনেক কৃষক উত্তর ও দক্ষিণের কয়েকটি জেলাতে শস্য-সবজি জোগান দিচ্ছেন। গাজোলের আহোড়া, ময়না, হাতিমারি; হবিবপুরের কেন্দপুকুর, ঋষিপুর, কানতুর্কা; বামনগোলার পাকুয়াহাট, নালাগোলা, জামতলা এবং পুরাতন মালদহের নবাবগঞ্জ, সাহাপুর প্রভৃতি এলাকা চাষে প্রভূত উন্নতি করেছে।

বরিন্দে খনি ভিত্তিক কোনও কাজ নেই। তাই কৃষিজ ফসল উৎপাদন ও মৎস্য উৎপাদন এখানকার প্রধান জীবিকা। তবে মাঝারি ও ছোট শিল্পের কয়েকটি কারখানা আছে। অতি সামান্য সংখ্যক মানুষ সেখানে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পান। ব্যবসাকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবিকার ক্ষেত্র প্রশস্ত হচ্ছে। সড়ক ও রেল যোগাযোগ ভাল থাকায় বরিন্দের জনপদে ব্যবসার প্রসার ঘটেছে। দুর্বৃত্তায়ন কম হওয়ায় এসব এলাকায় মোটা পুঁজির ব্যবসাও

চলে। এজন্য শহর-ঘেঁষা জনপদগুলির জায়গার দাম আকাশছোঁয়া। পরিষেবামূলক কাজের ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে।

আমকে কেন্দ্র করে টাঙন অববাহিকা অঞ্চলের সংস্কৃতি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। পুরাতন মালদহ, গাজোল ও হবিবপুরে প্রচুর আমবাগান আছে। প্রত্যেক মরশুমে আমবাগান বেশ কয়েক বার হাত-বদল হয়। পুরনো পাতা দেখে, নতুন কচিপাতা দেখে, মুকুল দেখে, গুটি দেখে, অপরিণত ফল দেখে ও শেষ ধাপে পরিণত ফল দেখে হাত-বদলের সমাপ্তি ঘটে। পাকা আম পাড়ার পরে খুচরো কিংবা পাইকারি বিক্রি হয়। তবে কাঁচা আমের কোনও আলাদা বাজার নেই। গ্রামাঞ্চলে শস্যের বিনিময়ে বাকিতে আমচারা কেনা-বেচা চলে। অনেকে কোনও পুঁজি বিনিয়োগ না-করেই বাগান ও ফল কেনা-বেচার কাজে মধ্যস্থতা করে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করেন। এখানকার আম মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে রফতানি হয়। অন্যান্য রাজ্যের ফল-প্রক্রিয়াকরণ কারখানাতেও এখানকার প্রচুর আম যায়। ঘরোয়া ভাবে অনেক মানুষ আমজাত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

শুধু অর্থনীতিতেই নয়, বরিন্দের সামাজিক জীবনেও আম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। আদিবাসীরা লাঠির পাতায় আমপাতা বেঁধে জরুরি আলোচনার জন্য জড়ো হওয়ার সংকেত দেন। ভিন এলাকার স্বজন-বন্ধুদের আম পাঠিয়ে এখানকার মানুষ সৌজন্য প্রদর্শন করেন। স্কুল-কলেজের গরমের ছুটিকে এখনও এখানে আমের ছুটি বলা হয়। এই এলাকার সাহিত্যেও আম একটি

বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। 'ফজলি' পত্রিকার আমকেন্দ্রিক নামকরণে তা স্পষ্ট। আর বরিন্দের বেশির ভাগ কবিই আম নিয়ে কিছু না কিছু লিখেছেন।[১]

মালদহের টাঙন অববাহিকার সাহিত্য-সংস্কৃতির অনেক অজানা দিক উন্মোচনের প্রয়াস প্রদর্শন করা হল। অতি আংশিক হলেও, বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বর্ণময় ও সীমাহীন ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা নবস্পন্দন জোগাবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. ফজলি, আম সংখ্যা, গ্রীষ্ম ১৪১২, সম্পাদনা: নির্মলেন্দু শাখারু, অতিথি সম্পাদক: ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, গাজোল, মালদহ থেকে প্রকাশিত। এই সংখ্যাটিতে আম নিয়ে ৩০ জন কবির ছড়া-কবিতা, দু-জন লেখকের গল্প ও ছয় জন লেখকের প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে।